বাংলাদেশে বুদ্ধিবৃত্তিক দুর্বৃত্তি

Written by ফিরোজ মাহবুব কামাল
Thursday, 05 August 2010 19:03 - Last Updated Sunday, 21 January 2018 15:14

চরিত্রহীনতা বা দুর্বৃত্তি শুধু চুরি-ডাকাতি, সন্ত্রাস, ঘুষখোরি, মদখোরি বা ব্যাভিচার নয়। সবচেয়ে বড় চরিত্রহীনতা বা দুর্বৃত্তি হলো মিথ্যাচার। বুদ্ধিজীবীদের ক্ষেত্রে সেটি যেমন হয় কথায় তেমনি হয় তাদের লেখনিতে। ব্যক্তির ক্ষেত্রে যেমন তার মগজ, জাতির ক্ষেত্রে তেমনি হলো বুদ্ধিজীবীরা। মগজ অসুস্থ্য হলে দেহের বল বা সুস্থ্যতা কোন কাজে লাগে না। তেমনি একটি দেশের বুদ্ধিজীবীগণ দুর্বৃত্ত হলে বা পথভ্রষ্ট হলে সেদেশের কৃষি-সম্পদ,খনিজ সম্পদ,শিল্প বা কলকারখানা সে জাতির জন্য কোন খ্যাতি, সম্মান বা সফলতা বয়ে আনে না। বরং তাদের কারণে জাতির জীবনে বাড়ে পথভ্রষ্টতা। এমন মিথ্যাচারী বুদ্ধিজীবীদের কারণেই দুর্বৃত্তি ছেয়ে গেছে বাংলাদেশে বুদ্ধিবৃত্তির ময়দানে। মিথ্যাচার ও দূর্নীতি পরিণত হয়েছে সংস্কৃতির উপাদানে।

ইসলামের মহান নবী(সাঃ) মিথ্যাচারকে সকল পাপের মা বলেছেন। কারণ, মিথ্যাচার থেকেই জন্ম নেয় সকল অপরাধ ও দুর্বৃত্তি। মিথ্যাচারির জীবনে সবচেয়ে বড় দুর্বৃত্তি ঘটে তার চিন্তা-চেতনায়। সেখানে কাজ করে চরম অসুস্থ্যতা। সে অসুস্থ্যতা পাল্টে দেয় ব্যক্তির রুচি,আচার-আচরন, জীবন-দর্শন, কর্ম ও সংস্কৃতি। চুরি-ডাকাতি, ঘুষখোরি বা লাম্পট্যের পথে মানুষ যে পা বাড়ায় -সে তাড়নাটি আসে মূলতঃ চেতনার সে অসুস্থ্যতা থেকেই, দৈহিক অসুস্থ্যতা থেকে নয়। সে অসুস্থ্য চেতনায় কোন অধর্ম, অপরাধ কর্ম বা পাপকর্মই রুচিহীন বা পরিতাজ্য গণ্য হয় না। ইসলাম তাই ব্যক্তির আমল ঠিক করার আগে আক্বিদা বা চেতনাকে শুদ্ধ করার উপর জোর দেয়। কোরআনের প্রথম আয়াতগুলো নাযিল হয়েছিল মূলতঃ সে লক্ষ্যপুরণে। ব্যক্তির মূল গোলামী বা দাসত্বটি আদৌ রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক নয়। সেটি প্রবৃত্তির। প্রবৃত্তির গোলামীতে সুনীতি বাঁচে না। তখন মারা পড়ে ন্যায়-অন্যায়ের বোধ। তখন দেহের উপর প্রবল স্বৈর-শাসন প্রতিষ্ঠা পায় নফসের তথা প্রবৃত্তির। প্রবৃত্তির সে গোলামীতে যেটি প্রবল ভাবে দেখা যায় সেটি স্বেচ্ছাচারি ভাবে জীবন উপভোগের নীতি। প্রবৃত্তির সে স্বৈরশাসন তখন আগ্রাসন চালায় অন্যের সম্পদ, সম্ভ্রম ও জানের উপর। ইসলামপূর্ব আইয়ামে জাহেলিয়াতের যুগে সেটাই ছিল সামাজিক রীতি। নফসের সে স্বৈরশাসন বা গোলামী ভাঙ্গার যুদ্ধকেই ইসলাম জিহাদে আকবার বা শ্রেষ্ঠ জিহাদ বলেছে। এমন জিহাদের অবর্তমানে ইসলামী সমাজ বা রাষ্ট্র নির্মাণ দূরে থাক,কোন ব্যক্তির পক্ষে মুসলমান রূপে বেড়ে উঠাই অসম্ভব। বরং প্রবল ভাবে যা বাড়ে সেটি হলো দুর্বৃত্তি। বাড়ে জীবনকে যেমন খুশি তেমন ভাবে উপভোগের নেশা। জীবন উপভোগের এমন নেশা গ্রাস করেছে পাশ্চাত্য দেশগুলোকে। বাংলাদেশেও সেকুলার সংস্কৃতির সেটাই এখন প্রবলতর দিক।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন, “সাতকোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননী, রেখেছ বাঙালী ক’রে, মানুষ করনি।” রবীন্দ্রনাথ বাঙালীর মানুষ রূপে বেড়ে উঠার ব্যর্থতা নিয়ে শত বছরেরও বেশী কাল আগে লিখেছিলেন। কিন্তু সে ব্যর্থতা কি দূর হয়েছে? দূর্নীতি বা দুর্বৃত্তিতে সমগ্র বিশ্বে বাঙালীর ৫ বার প্রথম হওয়াতে সে আশা দুরাশা মাত্র। গজফিতা দিয়ে যেমন দৈর্ঘ্য-প্রস্থ্য মাপা যায়, দুর্বৃত্তির পরিমাপ করা যায় তেমনি মিথ্যাচারিতা দিয়ে। আর সেটির পরিমাপে দেশের মাঠে-ময়দানে নামারও প্রয়োজন নেই। সমাজের যারা ক্রিম সেই বুদ্ধিজীবীদের দিকে নজর দিলেই সেটি সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। তাদের মিথ্যাচারিতা ছত্রে ছত্রে প্রবল ভাবে ছেয়ে আছে তাদের রচিত কবিতা, উপন্যাস, গ্রন্থ ও ইতিহাসে –বিশেষ করে একাত্তরের ইতিহাসে। মিথ্যাচারের অতি আধিক্যেই শেখ মুজিবের মত ব্যক্তি যিনি মানব হত্যা, গণতন্ত্র হত্যা, বাকস্বাধীনতা হত্যা, ধর্ষণ,সন্ত্রাস ও দুর্ভিক্ষ সৃষ্টিতে দেশের সমগ্র ইতিহাসে সবচেয়ে বড় কুখ্যাতি গড়লেন তাঁকে বলা হয় সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী। একাত্তর থেকে পঁচাত্তর পর্যন্ত অবধি শেখ মুজিব ও তাঁর দলীয় ক্যাডারদের অপরাধ ছিল অবাঙালী বিহারী হত্যা এবং তাদের ঘরবাড়ী ও দোকানপাঠ দখল এবং রক্ষিবাহিনীর দ্বারা রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ নির্মূল। শেখ মুজিব মারা গেছে। কিন্তু তাঁর অনুসারিরা ক্ষমতায় এসেছে, ক্ষমতার বাইরেও তারা কাজ করেছে। ক্ষমতায় আসার পর প্রতিবারই তাদের কাজ হয়েছে সরকারি জমিদখল,নদীদখল,বনদখল,হলদখল, ক্যাম্পাসদখল, টেন্ডারদখল এবং সরকারি অফিস-আদালত দখল। আর মুজিবের অনুসারি বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের কাজ হয়েছে কুর্মের এসব নায়কদের শ্রেষ্ঠ বাঙালী বলা। মিথ্যাচারের এ হলো নমুনা।

তবে লক্ষণীয় হলো, বাঙালী হওয়া নিয়ে যাদের গর্ব তাদের মাঝে সে মিথ্যাচারিতা আজকের নয়, বরং সেটি শত বছরেরও বেশী

1 / 8

বাংলাদেশে বুদ্ধিবৃত্তিক দুর্বৃত্তি

Written by ফিরোজ মাহবুব কামাল
Thursday, 05 August 2010 19:03 - Last Updated Sunday, 21 January 2018 15:14

পুরনো। এ রোগ তাদের মধ্যেও ছিল যারা বিখ্যাত বাঙালী। বাঙালীর প্রথম সারির লেখক ও বুদ্ধিজীবী হলেন শরৎচন্দ্র। অনেকের ধারণা, বঙ্কিম চন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের তুলনায় তিনি অনেক উদার ও মানবিক ছিলেন। দেখা যাক, তাঁর উপর আরেক বাঙালী শ্রী নীরদচন্দ্র চৌধুরী কি বলেন। তিনি তাঁকে কাছে থেকে প্রত্যক্ষ দেখেছেন এবং তার কথা শুনেছেন। তাঁর সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, “প্রথমেই দেখিলাম, যে সব বাঙালী কিছু পড়াশোনা করিয়াছে, তিনি তাহাদেরই মত পান্ডিত্যাভিমানী, অথচ পান্ডিত্য এমন কিছু নয়। তারপর দেখিলাম, বাঙালী “ন্যাশনাললিষ্ট”-এর মত তিনি সঙ্কীর্ণ, অন্য ভারতবাসীর, বিশেষত পাঞ্জাবীর উপর অবজ্ঞা পোষণ করেন। শিক্ষিত বাঙালীর এই দুইটি দুর্বলতা শরৎবাবু অতিক্রম করিয়া উঠিতে পারিবেন না, তাহা আমি ভাবিতে পারি নাই।” ¬-(নীরদচন্দ্র চৌধুরী,১৯৮৮)। অন্য ভাষাভাষী মানুষকে ঘৃনা করার এ অভ্যাস বাঙালী পেয়েছে তার স্বভাবজাত আত্ম-অহংকার, ইর্ষা ও হিংসা থেকে। আত্ম-অহংকারি মানুষকে অন্যরা কখনো আপন করে নেয়না। সে ব্যর্থতার শিকার শুধু পূর্ব বাংলার বাঙালীরাই নয়, পশ্চিম বাংলার বাঙালীদেরও। পশ্চিম বাংলার বাইরে কোন বাঙালী নেতা তাই ভারতে গ্রহণযোগ্যতা পায়নি।

জ্ঞানী, আলেম বা বুদ্ধিজীবী হওয়ার একটা বিশাল দায়বদ্ধতা আছে। ঘুমন্ত বা বেহুশ মানুষ আর জাগরিত মানুষের দায়বব্ধতা এক হয় না। এক হয় না জাহান্নামের পথযাত্রী আর জান্নাতের পথযাত্রী। আলেম বা বুদ্ধিজীবীরা হলো জনগণের মাঝে সবচেয়ে জাগ্রত শ্রেণী। তাদের যোগ্যতা বলেই একটি দেশ সামনে এগুয়। ঘরের জাগ্রত মানুষগুলোর কাজ, ঘরে চোরদের চৌর্যকর্ম অসম্ভব করে তোলা। তেমনি একটি জাতির বিবেকমান মানুষ ও বুদ্ধিজীবীদের দায়িত্ব হলো, দুর্বৃত্তদের দুরাচারকে অসম্ভব করা। এ জিহাদের মূল দায়িত্বটি মূলতঃ তাদেরই। নবীজী (সাঃ) ও তার সাহাবাগণ সে জিহাদ আজীবন লড়েছেন। তাদের দায়িত্বহীনতায় যেটি ঘটে সেটি সততা বা মানবতার ভরাডুবি। তাই দেশে দুর্বৃত্তদের জয়জয়াকার দেখা এ কথা নিশ্চিত করেই বলা যায়, বিবেকমান বুদ্ধিজীবীদের সংখ্যা সে দেশে কত নগন্য। ইসলামে জ্ঞানীদের মর্যাদা বহু উচ্চে। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, “সমগ্র সৃষ্টিকূলের মাঝে একমাত্র জ্ঞানীরাই আমাকে ভয় করে।” যে জ্ঞান সে ভয় সৃষ্টি করে না, বুঝতে হবে সে জ্ঞান প্রকৃত জ্ঞান নয়। এমন কুশিক্ষা ও কুজ্ঞান চোর-ডাকাত, সন্ত্রাসী-ব্যাভিচারী, দৃর্বৃত্ত রাজনীতিবিদ ও শাসকদেরও থাকে। সব খাদ্য-পানীয় পুষ্টি জোগায় না। খাদ্যপানীয়ের নামে বিষ পাণ হলে সেটি বরং মৃত্যকে অনিবার্য করে তোলে। তেমনি কুশিক্ষা ও কুজ্ঞানের ফলে মৃত্যু ঘটে মানবতার। অথচ সুশিক্ষা ও সুজ্ঞানের ফলটি বিশাল ও বিপ্লবাত্মক। সেটিই বাড়ায় মানুষের মানবিক গুণ। আনে চারিত্রিক বিপ্লব। সে জ্ঞান সাহসী করে সত্য ভাষণে ও মিথ্যার পরিহারে। তবে সেটি অর্জিত হয় শুধু কোরআনের পাঠে নয়, কোরআনী সত্যের আত্মীক অনুধাবনে। ফিরাউনের দরবারে যে তিনজন যাদুকর মৃত্যুকে অনিবার্য জেনেও হযরত মূসা (আঃ)এর দাওয়াত কবুল করেছিলেন -তারা সেটি করেছিলেন সে সত্যজ্ঞানের প্রবল বলে। সত্যের পক্ষে এমন সাক্ষ্যদান দুর্বৃত্তদের কাছে হত্যাযোগ্য অপরাধ। দুর্বৃত্তকবলিত দেশে সেটি সহজ নয়। দুর্বৃত্তদের দাবী, সাক্ষ্য বা ভোট দিতে হবে একমাত্র তাদের দল, নীতি ও রাজনীতির পক্ষে। গ্রহণযোগ্য নয়, সে নীতির কোনরূপ বিরুদ্ধাচারণ। সে অপরাধে ফিরাউনও সেদিন তিনজন যাদুকরকে হাত পা উল্টা দিক থেকে কেটে কেটে হত্যা করেছিল। নিষিদ্ধ করেছিল হযরত মূসা (আঃ)এর ইসলাম-প্রচার। এমন ফ্যাসীবাদ শুধু ফিরাউন, নমরুদ বা হিটলারের একার নয়। যুগে যুগে একই রূপ অভিন্ন বর্বরতা দেখিয়েছে সকল স্বৈরাচারি শাসকেরা। এমন স্বৈরাচারিরাই বাংলাদেশে একদলীয় বাকশাল কায়েম করেছিল। আইন করে নিষিদ্ধ করেছিল ইসলামের নামে সংগঠিত হওয়া বা শরিয়ত প্রতিষ্ঠার রাজনীতি। আল্লাহর বিধান শরিয়ত যে শ্রেষ্ঠ বিধান সে বিষয়ে জনতার সামনে সাক্ষ্যদানও তাদের কাছে অপরাধ। সেটিকে তারা বলছে মৌলবাদ। জিহাদ যে সমাজ বিপ্লবের আল্লাহর নির্দেশিত হাতিয়ার এবং নবীজী (সাঃ)র জীবনের বড় শিক্ষা সে সত্যটির পক্ষে কথা বলাটিও চরমপন্থি রূপে বর্নিত হচ্ছে। অথচ তারা নিজেরা সর্বশক্তি দিয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছে মার্কসবাদ, সমাজবাদ, পুঁজিবাদ, সেকুলারিজম, জাতিয়তাবাদের পক্ষে। মতবাদের নামে গড়ে উঠা সেসব সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতাকে খাড়া করেছে আল্লাহ ও তাঁর শরিয়তি বিধানের বিরুদ্ধে প্রতিপক্ষ রূপে।

মানুষের সবচেয়ে বড় গুণ হলো সত্য বলার সাহস। ব্যক্তির জীবনে সে সাহস বা বল আসে নিজ মনে সে নিরেট সত্য প্রবল ভাবে প্রতিষ্ঠা পাবার পর। তখন নানা ভয়ভীতির মাঝে ঈমানদার ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর দ্বীনের পক্ষে প্রকাশ্যে সাক্ষ্য দেয়। কারণ সে জানে, এরূপ সাক্ষ্য না দেওয়ার অর্থ কাফের হয়ে যাওয়া। পরিণতি, জাহান্নামের আগুন। কোন সুস্থ্য মানুষ কি জেনে বুঝে আগুনে পড়তে চায়? আসল জ্ঞান ও প্রজ্ঞার পরিচয় তো সে আগুন থেকে বাঁচার সামর্থ। মুসলমান হওয়ার পথে এ সাক্ষ্যদানটিই প্রথম ধাপ। ইসলামের পরিভাষায় এটাই শাহাদাতে হক্ক, তথা সত্যের পক্ষে সাক্ষ্যদান। ব্যক্তির জীবনে প্রকৃত বিপ্লব শুরু হয় এর পর থেকে। একাজটি কালেমায়ে শাহাদাত পাঠে শুরু হয় মাত্র, শেষ হয় না। বরং প্রতি দিন এবং প্রতি পদে এ সাক্ষ্য তাকে বার বার দিতে হয়। কারণ সত্য ও মিথ্যা, ন্যায় ও অন্যায়, জালেম ও মজলুলের মুখোমুখি তাঁকে প্রতিদিনই হতে হয়। মুসলমান রূপে বাঁচার কাজটি তাই শুধু মসজিদ,

2 / 8

বাংলাদেশে বুদ্ধিবৃত্তিক দুর্বৃত্তি

Written by ফিরোজ মাহবুব কামাল
Thursday, 05 August 2010 19:03 - Last Updated Sunday, 21 January 2018 15:14

মাদ্রাসা, খানকা বা ঘরে বসে চলে না। ঈমান নিয়ে বাঁচতে হয়ে জীবনে প্রতিক্ষেত্রে ও প্রতি কর্মের মাঝে। সেটি যেমন রাজনীতি ও আইন-আদালতে তেমনি বুদ্ধিবৃত্তিতেও। জীবনে প্রতি পদে এবং প্রতি কর্মে এমন সাক্ষ্যদানের ফলে শুধু নিজের বিবেকেই নয়, অন্যদের বিবেকের আদালতে এবং সমাজ ও রাষ্ট্রে আল্লাহর বিধান বিজয়ী হয়। যে দেশে এমন মানুষের সংখ্যা কম সে সমাজে মুসলমান নামধারি নামাযী বা রোযাদারের সংখ্যা যত বিশালই হোক, ইসলামের বিজয় আসে না। সম্ভব হয় না শরিয়তের প্রতিষ্ঠা। বরং বিজয়ী হয় আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী দুর্বৃত্তরা। আর বাংলাদেশ পরিণত হয়েছে তেমনি এক দেশে। তবে শরিয়ত বা আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধে লাগাতর শত্রুতাই বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের একমাত্র দুর্বৃত্তি নয়। তাদের অপরাধের ফিরিস্তি বিশাল। চোখের সামনে জুলুম, হত্যা ও মিথ্যাচার দেখেও তার না দেখার ভান করে –শুধু এখনই নয়, অতীতেও। এক্ষেত্রে তাদের হাতে সবচেয়ে বড় অপরাধটি ঘটেছে একাত্তরে। সত্যকে গোপন করার এমন ঘটনা ইতিহাসে বিরল। বাংলাদেশের ইতিহাসে কোন কালেই এতবড় বিশাল আকারের অপরাধকর্ম ঘটেনি। তখন নিহত হয়েছে যেমন হাজার হাজার বাঙালী, তেমনি হাজার হাজার আবাঙালীও। অবাঙালীদের হাতে বাঙালী হত্যার ন্যায় বর্বর অপরাধগুলি নিয়ে আত্মসমালোচনার ভার অবাঙালীদের। তবে তাতে বাঙালীদের দায়িত্ব শেষ হয়না। বিহারী-পাঞ্জাবীদের গালী দিয়ে বাঙালীদের নিজেদের অপরাধকে ঢাকা যাবে না, এভাবে নিজেদের মহামান্বিতও করা যাবে না। নিজেদের হিসাব নিজেদেরই নিতে হবে এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের কাছে জানিয়ে যেতে হবে একাত্তরে তাদের নিজেদের কর্মগুলি কতটা মানবিক ছিল।

বিবেকমান মানুষ তো তারাই যারা অন্যের কাছে হিসাব দেওয়ার আগে নিজেরাই নিজেদের হিসাব নেয়। একাত্তরে বহুলক্ষ বিহারী নারী,শিশু ও পুরুষ বাঙালীর হাতে এতে নিহত হয়েছে। বহু হাজার অবাঙালী নারী ধর্ষিতাও হয়েছে। এদেশে তারা বনজঙ্গলে বাস করতো না। তাদের ঘরবাড়ী ছিল, চাকুরি-বাকুরি এবং ব্যবসা-বাণিজ্যও ছিল। তাদের থেকে সবকিছু ছিনিয়ে নেওয়া হয়। সে হত্যা ও নির্যাতনের বিবরণ ছাপা হয়েছে বিশ্বের নানা পত্রিকায়। কিন্তু আজব বিষয়, সেসব প্রকাশ পায়নি বাংলাদেশের কোন পত্রিকায়। লেখা হয়নি বাংলাদেশী কোন লেখকের বইয়ে। সত্য লুকানোর একাজ কি কম দুর্বৃত্তি? অথচ সে বীভৎস কুকর্ম নিয়ে ১৯৭১ সালের ১৩ই জুন লন্ডনের দি টাইমস পত্রিকায় রিপোর্ট ছেপেছিল,”১৯৪৭ সালের পর বিহার থেকে উদ্বাস্তু রূপে যারা পূর্ব পাকিস্তানে আশ্রয় নিয়েছিল সে হতভাগা মানুষদের হাজার হাজার পরিবারকে নিশ্চিহ্ন করা হয়। মহিলাদের ধর্ষণ করা হয়। তাদের স্তনকে বিশেষ অস্ত্রের সাহায্যে কর্তন করা হয়। শিশুদেরও রেহাই দেওয়া হয়নি। শিশুদের মাঝে তারা ছিল ভাগ্যবান যাদেরকে তাদের পিতামাতার সাথে হত্যা করা হয়েছিল। কিন্তু বহু হাজারকে এমন এক জীবনের শিকার হতে হয়েছে যে তাদের চোখ উপড়ানো হয়েছে, হাত-পাকে অতি নির্মম ভাবে থেথলিয়ে ছিন্ন করা হয়েছে। চট্টগ্রাম, খুলনা, যশোরের ন্যায় বড় বড় শহরে ২০ হাজারেরও বেশী অবাঙালীদের মৃত দেহ পাওয়া গেছে। আসল সংখ্যা পূর্ব বাংলা জুড়ে এক লাখের বেশী হবে।” একই রূপ ভয়াবহ কুৎসিত চারিত্রিক রূপ আবার প্রকাশ পায় ২০০৯ সালে ঢাকার পিলখানায়। হাজার হাজার বাঙালী দুর্বৃত্তরা তখন ৫৭ জন সেনা অফিসারকে নির্মম ভাবে হত্যা করে। ড্রেনে ফেলে দেয় বা মাটি চাপা দেয় তাদের লাশ। ধর্ষণ ও পাশবিক অত্যাচারের শিকার হয়েছিল তাদের স্ত্রী-কন্যারা। একই রূপ পশুরা একাত্তরে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল অবাঙালী নারী-পুরুষ-শিশুদের উপর। বিদেশী পত্রপত্রিকার পাতায় আজও সে নৃশংস বীভৎসতা অক্ষয় হয়ে আছে। দেশে-বিদেশে আজও তার উপর গবেষণা হয়, বইও লেখা হয়। বাঙালীর ইতিহাসে এগুলো পরিণত হয়েছে গুরুত্বপূর্ণ উপাদানে।

খুনি বা ধর্ষনকারিদের অপরাধ খুন ও ধর্ষনের মধ্যে। কিন্তু এর বাইরেও দুর্বৃত্ত-কবলিত একটি সমাজে বহু অপরাধ ঘটে। ঘটে অপরাধকে আড়াল করার মধ্য দিয়েও। তবে জঘন দুর্বৃত্তি হয় অপরাধকে অপরাধ রূপে ঘৃনার না করার মধ্য দিয়ে। আর সেটিই হলো বড় রকমের বুদ্ধিবৃত্তিক দুর্বৃত্তি। সে অপরাধ বা দুর্বৃত্তি যখন সমাজে প্রকান্ড আকার ধারণ করে তখন ঘৃণ্য অপরাধীদেরও সম্মানিত করা হয়। ভাল-মন্দ বিচারের মানদন্ডই তখন পাল্টে যায়। এমন সমাজে জঘন্য অপরাধও উৎসব-ভরে বার বার হয়। ইসলাম অপরাধীকে তাই শুধু ঘৃণা করতেই নয়, তাদের প্রতিরোধকেও ফরয করেছে। নামায-রোযার ন্যায় পবিত্র কোরাআনে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা এবং অন্যায়ের প্রতিরোধের নির্দেশ এসেছে বার বার। কিন্তু বাংলাদেশে মহান আল্লাহর সে নির্দেশ পালিত হয়নি। বরং উল্টোটিই হচ্ছে। একা্ত্তের যে লক্ষাধিক বিহারীকে হত্যা করা হলো এবং তাদের হাজার হাজার দোকানপাঠকে জবর দখল করা হলো -সে কুকর্মকে ঘৃণা করে কেউ কি কোন বই লিখেছে? ইতিহাসের বইয়ে কি সে অপরাধ নিয়ে একটি পৃষ্ঠাও লেখা হয়েছে? যে সমাজে এতবড় অপরাধও অপরাধ রূপে স্বীকৃতি পায় না বরং সেগুলোকে লুকিয়ে ফেলা হয়, সে সমাজে কি নিত্যদিনে ঘটা খুন, ধর্ষন, চুরি-ডাকাতি ও লুটতরাজ নিন্দনীয় হয়? বাংলাদেশে আজ দিনদুপুরে টেন্ডার দখল, হল দখল, সরকারি ভূমিদখল, নদীদখল, বনদখল, সুপ্রিম কোর্টে বস্তি পাঠানো, লগি-বৈঠা দিয়ে মানুষ খুন হয় –এ ধরনের নানা অপরাধ তো হয় তেমনি এক প্রেক্ষাপটে।

শুধু স্বাস্থ্য নিয়ে বই লিখলে স্বাস্থ্য বাঁচে না। এজন্য জীবননাশী রোগগুলোকে জানতে হয়। এ প্রয়োজন মেটাতে

3 / 8

বাংলাদেশে বুদ্ধিবৃত্তিক দুর্বৃত্তি

Written by ফিরোজ মাহবুব কামাল
Thursday, 05 August 2010 19:03 - Last Updated Sunday, 21 January 2018 15:14

বিশাল বিশাল বই লেখা হয়েছে এবং গড়ে উঠেছে বিশাল চিকিৎসা বিজ্ঞান। একই কারণে সমাজে সুস্থ্যতা আনতে হলে সমাজের জঘন্য কীটগুলোকেও জানতে হয়। দেশের সুন্তানদের যেমন জানতে হয় তেমনি কুৎসিত-কুলাঙ্গারদেরও জানতে হয়। তাই বাঙালীর মানবিক উন্নয়নের স্বার্থেই তাদের দ্বারা একাত্তরে ঘটে যাওয়া কুকর্মের জঘন্য বিষয়গুলোকেও পাঠ্যপুস্তকে স্থান দেওয়া উচিত ছিল। স্থান পাওয়া উচিত ছিল বিহারী হত্যার মত অতি অমানবিক বিষয়টি। এতে বাঙালীরা অন্ততঃ তাদের নিজেদের রোগটি নিজেরা জানতে পারতো। তাতে রোগমুক্তির কাজ সহজতর হতো। কিন্তু বাংলাদেশে সেটি হয়নি। ২০০৯ সালে ঢাকার পিলখানায় ৫৭জন সেনা-অফিসার যেরূপ নির্মম ভাবে মারা গেল -সেটি কোন চিহ্নিত দুর্বৃত্তদের কাজ ছিল না। বরং ছিল তাদের কাজ যারা সমাজে বীর জোয়ান রূপে পরিচিত –খুন ও অপরাধকে প্রতিহত করাই ছিল যাদের সুনির্দ্দিষ্ট কাজ। এবং এ কাজের জন্যই তাদের বেতন দেয়া হত। অথচ তারা যে কতটা উৎসব ভরে সে খুনগুলো ঘটালো সে চিত্র সে সময় টিভিতে দেখানো হয়েছে। অতি বীভৎস অপরাধ যে করছে -সে বোধটিও তাদের মধ্যে ছিল না। একাত্তরে একই ভাবে উৎসব-ভরে অবাঙালীদের হত্যা করা হয়েছে। সেদিনও সেটিকে তারা অপরাধ মনে কররেনি। কোন রূপ বিচারও বসেনি। বরং সেটিকে বাঙালীর গর্বের কাজ মনে করা হয়েছে। একই রূপ গর্ব-ভরে তাদের ঘরবাড়ী-দোকানপাঠ জোরপূর্বক দখল করা হয়েছে। এটি এক ভয়ংকর রকমের নৈতিক অসুস্থ্যতা। অথচ সে অসুস্থ্যতা নিয়ে এমন দুর্বৃত্তদের বসবাস শুধু গ্রাম বা শহরের মহল্লায় নয়, বরং অফিস-আদালত, সেনাপল্লি ও রাজনীতির অঙ্গনে। এবং তাদের হাতে শুধু রাজনীতি এবং প্রশাসনই নয়, অত্যাধুনিক অস্ত্রও। এমন অবস্থায় কি কোন দেশের জনগণ নিরাপত্তা পেতে পারে? জনগণ কি নিরাপত্তা পাবে, শেখ মুজিব নিজেও সেটি পাননি। জিয়াউর রহমানও পাননি। সাধারণ মানুষও তাই পাচেছ না। নৈতিক এ অসুস্থ্যতা যে শুধু কিছু পেশাদার খুনিদের মাঝে তা নয়, সেটি ছড়িয়ে আছে দেশের প্রশাসন, পুলিশ, সেনাবাহিনী, বিচারব্যবস্থা ও বুদ্ধিবৃত্তিতে। তাই একাত্তরে এতবড় বিশাল মাপের অপরাধের জন্যও কারো কোন জেল-জরিমানা হয়নি, কারো গায়ে কোন আঁচড়ও লাগেনি। বরং তাদেরকে পুরস্কৃত করা হয়েছে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ সন্তান বলে। সরকারের পক্ষ থেকে পুরস্কৃত করা হয়েছে জবরদখলকৃত ঘর বা দোকানের আইনগত মালিকানা দিয়ে। আর আসল মালিকগুলো এখনও বাস করছে বস্তিতে।

চোখের সামনে খুন, ধর্ষন,লুন্ঠন হতে দেখে চুপ থাকাটি নিতান্তই পশুর কাজ, মানুষের নয়। সেটি সম্ভব হয় মানুষ যখন বিবেকশূণ্য হয়। হত্যা, লুটতরাজ, বলাৎকালের নিন্দা করার জন্য বেশী মানবিক গুণ লাগে না। বহু নিরক্ষর শিশুরও সে গুণ থাকে। প্রশ্ন হলো, বাংলাদেশের প্রথম সারির বুদ্ধিজীবীদের বিবেকের সে বল কতটুকু? সে প্রমাণও কি কম? উদাহরন দেয়া যাক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের প্রফেসর এবং পরবর্তীতে ভিসি ছিলেন জনাব ড. সাজ্জাদ হোসাইন। তাকে ১৬ই ডিসেম্বরের পর মুক্তিবাহিনীর লোকেরা বাসা থেকে ধরে নিয়ে নির্মম ভাবে দৈহিক ভাবে নির্যাতন করে এবং নির্যাতন শেষে মৃত মনে করে রাস্তায় ফেলে যায়। জনাব সাজ্জাদ সাহেবের দেহে আঘাতের মাত্রা এতটাই গুরুতর ছিল যে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ব্যথায় কষ্ট পেয়েছেন। অথচ সে প্রসঙ্গটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরেক প্রফেসর জনাব সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী উল্লেখ করেছেন এ ভাষায়: “মুক্তিবাহিনীর ছেলারা তাঁকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল, অত্তুৎসাহী কয়েকজন তাঁকে লাঞ্ছিত করেছিল, তিনি রক্ষা পেয়েছিলেন ভারতীয় বাহিনীর হস্তক্ষেপে,যারা তাঁকে ঢাকা কারাগারে কেন্দ্রীয় কারাগারে নিয়ে পৌছে দিয়েছিল।” –(সিরাজুল ইসলাম চৌধুরি, ২০০৮)। মুক্তিবাহিনীর এমন সদস্যরাই একই রূপ অত্যাচার শেষে মৃত জ্ঞান করে রাস্তার পাশে ফেলে যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরেক শিক্ষক ড.হাসান জামানকে। তবে প্রাণে বাঁচেননি প্রখ্যাত পার্লামেন্টেরীয়ান এবং পাকিস্তান সরকারের এককালের কেন্দ্রীয় মন্ত্রি জনাব মৌলবী ফরিদ আহমদ। তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকবাল হলে তাঁকে নির্মম ভাবে হত্যা করে। মৌলবী ফরিদ আহমদের মত মুক্তিবাহিনীর নির্যাতন থেকে বাঁচেননি হাজার হাজার আলেম, রাজনৈতিক কর্মী ও ছাত্র যারা একাত্তরে অখন্ড পাকিস্তানের পক্ষে ছিলেন। এরূপ প্রতিটি হত্যা ও নির্যাতনের ঘটনাই ছিল অতি নির্মম ও লোমহর্ষক। এমন অমানবিক অত্যাচারের নিন্দা করার সামর্থ অর্জনে বড় মাপের মানবিক হওয়ার জন্য প্রয়োজন পড়ে না। কিন্তু সে পরিচয় দিতে পারেননি জনাব সিরাজুল ইসলাম চৌধুরি। পারেননি অন্যান্য বাঙালী বুদ্ধিজীবী বা শিক্ষকেরাও। খুনি ও নির্যাতকারিদের পশুসুলভ সে আচরণকে জনাব সিরাজুল ইসলাম চৌধুরি নিন্দা না করে বলেছেন মুক্তিবাহিনীর কয়েকজন অত্তুৎসাহীর কান্ড। দৈহিক নির্যাতনের যে মারাত্মক ঘটনাটি ঘটলো তাতে সাজ্জাদ সাহেবের প্রাণে বাঁচার সম্ভাবনা ছিল সামান্যই, বেঁচেছিলেন নিতান্তই মহান আল্লাহতায়ালার মেহেরবাণীতে। সে ঘটনাকে “জনাব সাজ্জাদ সাহেব কয়েকজন অত্তুৎসাহীর হাতে লাঞ্ছিত হয়েছেন” বলে তার ভয়াবহতাকে সাধারণ পাঠকের কাছে সামান্য ঘটনা রূপে পেশ করার চেষ্ঠা করেছেন। আওয়ামী লীগের ক্যাডার এবং মুক্তিবাহিনীর সদস্যারা একাত্তরে যে অসংখ্য নৃশংস ও বর্বর ঘটনাগুলো ঘটালো, বাঙালী বুদ্ধিজীবীগণ সেসব গুরুতর অপরাধগুলোর উপর সুগারকোট লাগিয়েছেন। একই ভাবে তারা সুগারকোট লাগিয়েছেন ভারতীয় লুন্ঠনের উপর -যা উপহার দিয়েছিল বাংলাদেশের ইতিহাসে অতি ভয়ানক একটি দুর্ভিক্ষকে। অতীতে যে শুধু গণহত্যা হয়েছে তাই নয়। গণতন্ত্র হত্যা হয়েছে, হরণ করা হয়েছে বাকস্বাধীনতা। বন্দ্ধ করা হয়েছে সকল

4 / 8

বাংলাদেশে বুদ্ধিবৃত্তিক দুর্বৃত্তি

Written by ফিরোজ মাহবুব কামাল
Thursday, 05 August 2010 19:03 - Last Updated Sunday, 21 January 2018 15:14

পত্র পত্রিকা। লুটতরাজ হয়েছে জনগণের সম্পদ। দেশে আজও দুর্বৃত্তদের থাবা সর্বত্র বিস্তৃত। একাত্তরে তারা যেভাব বিহারীদের বাড়ী-ঘর ও দোকন দখল করেছিল, এখন একই ভাবে চলছে সরকারি জমিদখল, নদী দখল, বনদখল,টেন্ডারদখল ও রাস্তার সরকারি গাছ দখলের কাজ। রাজপথে লগি-বৈঠা নিয়ে নিরীহ মানুষ হত্যা যেমন হয়েছে, যাত্রি ভর্তি বাসে তেমনি আগুনও দেয়া হয়েছে। চলছে প্রচন্ড ফ্যাসীবাদ। কিন্তু তা নিয়েই বা বুদ্ধিজীবীদের মাঝে কোথায় আলোচনা? লেখা হয়েছে ক’খানা বই? ফলে বুদ্ধিবৃত্তিতে যে এখনও সুনীতি ও বিবেকবোধ বেঁচে আছে সে প্রমাণ কৈ?

বুদ্ধিবৃত্তিক দুর্বৃত্তির আরেকটি উদাহরণ দেওয়া যাক। বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী জগতের বিখ্যাত তারকা হলেন প্রফেসর মুজাফ্ফার আহম্মদ চৌধরী। তিনি ঢকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিও হয়েছিলেন। তার প্রতি শ্রদ্ধায় অনেকে মাথা নত করেন। দেখা যাক তাঁর সততা, বিবেকবোধ ও সুবৃত্তির মান। তাঁর সম্মদ্ধে প্রফেসর সাজ্জাদ সাহেব তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা লিখেছেন এভাবেঃ "পলিটিক্যাল সায়েন্সের প্রফেসর মুজাফ্ফর আহম্মদ চৌধরীকে ভাইস চ্যান্সেলর নিযুক্ত করা হয়। ইনি ভারত-প্রত্যাগত। আমার মনে আছে ষাটের দশকে ইনি 'সোনার বাংলা' পাকিস্তান আমলে কিভাবে শ্মশানে পরিণত হয়েছে সে সম্মন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ইউনিভার্সিটিতে যে কয়েকজন শিক্ষক আওয়ামী লীগ আন্দোলনে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন মুজাফ্ফার আহম্মদ চৌধরী তাদেরই একজন। যদিও কর্মজীবনে একাত্তরের আগে তাঁর সাথে আমার সদভাব ছিলো, এখন পরিবর্তিত অবস্থায় তিনি আমাকে কতটা ঘৃণা করেন সেটা বুঝলাম আমার পরিবারের প্রতি তাঁর ব্যবহারে। আমি আগে বলেছি যে ১৫ই ডিসেম্বরে আমরা তড়িঘড়ি করে কাপড়ের দুটো সুটকেস নিয়ে ভাইস চান্সেলরের বাসা থেকে পুরনো ঢাকার বাসায় চলে এসেছিলাম। আমার বই, আসবাবপত্র, রান্নাঘরের সরঞ্জাম, বিছানার চাদর, বালিশ, হাড়ি ডেকচি, শিলপাটা সবই ফেলে এসেছিলাম। মুজাফ্ফার আহম্মদ চৌধরী যখন ভাইস চ্যান্সেলের বাসায় পাকাপাকি ভাবে অবস্থান গ্রহণ, আমার মেযেরা আমাদের মালপত্রগুলো উদ্ধার করতে যায়। প্রথম দু'দিন ওদের গেট থেকেই বিদায় দেওয়া হয়। শেষ পর্যন্ত যখন ওরা ভিতরে যেতে অনুমতি পায় তখন বলা হয় যে আমাদের মালপত্র ওখানে কিছুই নেই। বাসায় যা আছে তা ইউনিভার্সিটির সম্পত্তি। সেটা কিছুতেই দেওয়া যাবে না। আমার ব্যক্তিগত বই দু' কামরা সাজানো ছিলো। এক কামরায় কিছু বই মেয়েরা উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। অন্য কামরায় ওদের যেতেই দেওয়া হয়নি। ফলে ছাত্র জীবন থেকে সংগৃহীত বহু মূল্যবান বইপত্র আমাকে হারাতে হয়েছে। যেসব জিনিস মেয়েদের চোখের সামনে পড়ে এবং যেগুলি তারা চিনতে পারছিলো সেগুলিও এদের স্পর্শ করতে দেওয়া হয়নি। এর মধ্যে ছিলো আমাদের পুরানো শিল পাটা। এবং রান্না ঘরের হাড়িপাতিল। আমার বড় মেয়ে বিযেতে একটা সুন্দর কার্পেট উপহার পেয়েছিলো। সেটা দেখতে পেয়ে মেয়েরা যখন বলে, ওটা বড় আপার কার্পেট, তখন ওদের এই বলে ধমকে দেওয়া হয় যে ওরা যেন ফাকিঁ দিয়ে নতুন ভাইস চান্সেলরের জিনিসপত্র হরণ করার চেষ্টা না করে।" -(ডক্টর সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন, ১৯৯৩)। এই হলো একজন ভিসি এবং তাঁর পরিবারের নৈতিকতার মান। প্রশ্ন হল, বস্তিবাসী এক দুর্বৃত্ত মাস্তান ও তার পবিবার থেকে এক্ষেত্রে পার্থক্য কোথায়?

জাতীয় জীবনে শুদ্ধি বা সংস্কারের কাজের শুরু যেমন বুদ্ধিজীবীদের থেকে, পচনের শুরুও তেমনি সেখান থেকে। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পর ঢাকার বুদ্ধিজীবীদের মাঝে কিছু সৃষ্টিমুখিতা দেখা দিয়েছিল। কিন্তু কলকাতার বুদ্ধিজীবীদের মাঝে তখন চলছিল প্রচন্ড আত্মঘাত। মারা পড়েছিল বিবেকবোধ। কিন্তু যে আত্মঘাত কলকাতাকে আচ্ছন্ন করেছিল সে আত্মঘাতি বুদ্ধিবৃত্তিই দ্রুত গ্রাস করে নেয় ঢাকার বুদ্ধিজীবী মহলকে। ফলে কলকাতার বুদ্ধিজীবীদের ন্যায় ঢাকার বুদ্ধিজীবীরাও একই ভাবে একই স্রোতে ভেসে যায়। এবং সেটি দুর্বৃত্তির। কলকাতার সে বুদ্ধিবৃত্তিক দুর্বৃত্তির কিছু চোখে দেখা হাল বর্ণনা করেছেন প্রখাত শিক্ষাবিদ এবং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক প্রফেসর ডক্টর তপন রায় চৌধুরী তার “বাঙাল নামা” বইতে। বাঙালীর তখন রেঁনেসার যুগ, আর সে রেঁনেসার প্রাণপুরষ ছিলেন কলকাতা কেন্দ্রীক বুদ্ধিজীবীগণ। বাঙালীর বাঘাবাঘা লেখক, রাজনীতি কবি-সাহিত্যিক,অধ্যাপক, বুদ্ধিজীবীদের বাস তখন কলকাতা নগরীতে। আর সে নগরীতেই ১৯৪৬ সালের ১৬ আগষ্ট শুরু হলো অতি নিষ্ঠুরতম হত্যাযজ্ঞ। সে সময় তিনদিন ধরে কলকাতায় মুসলমান নিধনযজ্ঞ চলে। সরকারি হিসাব মতে বলা হয় তিন

5 / 8

বাংলাদেশে বুদ্ধিবৃত্তিক দুর্বৃত্তি

Written by ফিরোজ মাহবুব কামাল
Thursday, 05 August 2010 19:03 - Last Updated Sunday, 21 January 2018 15:14

হাজার স্ত্রী-পুরুষ-শিশু খুন করা হয়। সরকারি এ হিসাবটি দেওয়া হয়েছিল যে সব লাশ মর্গে নেওয়া হয়েছিল সেগুলো গুণে। কিন্তু বেশীর ভাগ লাশ ফেলা হয়েছিল কলকাতার ড্রেনের ম্যানহোলে বা ভাগিরথি নদীতে। বেসরকারি হিসাব মতে নিহতদের সংখ্যা দশ থেকে পঞ্চাশ হাজার।–(তপন রায়চৌধুরী, ২০০৭)। অর্থাৎ নব্বইয়ের দশকে গুজরাতের কুখ্যাত হত্যাকান্ডে যতজন মুসলমান হত্যা করা হয়েছিল এ সংখ্যা ছিল তার প্রায় বিশগুণ। তবে পার্থক্যটা হলো, গুজরাতের দাঙ্গায় নিহতদের পক্ষে ও দুর্বৃত্তদের নিন্দায় বহু অমুসলিম ও অবাঙালী বুদ্ধিজীবী ও সাংবাদিক কলম নিয়ে এগিয়ে আসলেও কলকাতার মুসলিম হত্যার নিন্দায় কোন বাঙালী বুদ্ধিজীবী এগিয়ে আসেনি। এটি তাদের এক বড় বুদ্ধিবৃত্তিক ব্যর্থতা ও দুর্বৃত্তি। বরং তারা সেদিন দোষ চাপিয়েছিল মুসলমানদের উপর। অভিযোগ তুলেছিল, তারা নাকি কলকাতার ৭৫% হিন্দু বসতিকে নির্মূল করতে চেয়েছিল। যেমন ঢাকার কয়েক লক্ষ বিহারীদের উপর দোষ চাপানো হয় তারা নাকি সাড়ে সাত কোটি বাঙালীদের নির্মুল করতে চেয়েছিল। মোম্বাই ও গুজরাতের দাঙ্গাকারি হিন্দুরাও একই দোষ চাপায় মুসলমানদের উপর। বলে, সে দেশের সংখ্যালঘু মুসলমানরা সারা ভারত দখলে নিতে চায়।

১৯৪৬ সালে কলকাতায় মুসলিম হত্যা নিয়ে প্রফেসর ড.তপন রায়চৌধুরি লিখেছেন, “নিজের চোখে দেখা ঘটনার বিবরণে ফিরে যাই। হস্টেলের বারান্দা থেকে দেখতে পেলাম রাস্তার ওপারে আগুন জ্বলছে। বুঝলাম ব্যাপারটা আমার চেনা মহাপুরুষদেরই মহান কীর্তি। হস্টেলের ছাদে উঠে দেখলাম –আগুন শুধু আমাদের পাড়ায় না, যতদূর চোখ যায় সর্বত্র আকাশ লালে লাল। তিন দি্ন তিন রাত কলকাতার পথে ঘাটে পিশাচনৃত্য চলে। … দাঙ্গার প্রথম ধাক্কা থামবার পর বিপজ্জনক এলাকায় যেসব বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন ছিলেন, তাঁদের খোঁজ নিতে বের হই। প্রথমেই গেলাম মুন্নুজন হলে। ..নিরঙ্কুশ হিন্দু পাড়ার মধ্যে ওদের হস্টেল। তবে ভদ্র বাঙালি পাড়া। সুতরাং প্রথমটায় কিছু দুশ্চিন্তা করিনি। কিন্তু দাঙ্গা শুরু হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যে শিক্ষিত বাঙালির রুচি-সংস্কৃতির যেসব নমুনা দেখলাম, তাতে সন্দেহ হল যে, মুন্নুজান হলবাসিনী আমার বন্ধুদের গিয়ে আর জীবিত দেখবো না। …হোস্টেলের কাছে পৌঁছে যে দৃশ্য দেখলাম তাতে ভয়ে আমার বাক্যরোধ হল। বাড়ীটার সামনে রাস্তায় কিছু ভাঙা স্যুটকেস আর পোড়া বইপত্র ছড়ানো। বাড়িটা খাঁ খাঁ করছে। ফুটপথে এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়েছিলেন। বললেন – একটু আগে পুলিশের গাড়ি এসে মেয়েদের নিয়ে গেছে।…শুনলাম ১৬ই আগষ্ট বেলা এগারোটা নাগাদ একদল সশস্ত্র লোক হঠাৎ হুড়মুড় করে হস্টেলে ঢুকে পড়ে। প্রথমে তারা অশ্রাব্য গালিগালাজ করে যার মূল বক্তব্য –মুসলমান স্ত্রীলোক আর রাস্তার গণিকার মধ্যে কোনও তফাৎ নেই। …হামলাকারিরা অধিকাংশই ছিলেন ভদ্রশ্রেণীর মানুষ এবং তাঁদের কেউ কেউ ওঁদের বিশেষ পরিচিত, পাড়ার দাদা। ” –(তপন রায়চৌধুরী, ২০০৭)। কলকাতার শিক্ষিত হিন্দু ভদ্রসমাজ ও তাদের বুদ্ধিজীবীগণ মুসলমানদের পুড়িয়ে মারাতে বড্ড পুলক বোধ করছিল। তাদের হাত থেকে সেদিন অসহায় মুসলিম নারীদের সম্ভ্রম বেঁচেছিল কিনা সে খবর ড. তপন রায় জানতে পারেননি। তার পক্ষে জানা সম্ভবও ছিল না। মুন্নুজান হলের সামনে তিনি শুধু ভাঙ্গা স্যুটকেস আর তছনছ করা রুম দেখেছেন। মেয়েদের হোস্টেল অর্থশালী ব্যবসায়ী বা জমিদারের বাড়ি নয় যে তারা সেখানে অর্থের খোঁজে হানা দিবে। মেয়েদের ইজ্জত দূরে থাক তাদের প্রাণে বাঁচাই যে সেদিন অসম্ভব ছিল তা নিয়ে তিনি চোখে দেখা বিররণ দিয়েছন এভাবে, “খুনজখম বলাৎকারের কাহিনী চারি দিক থেকে আসতে থাকে। …বীভৎস সব কাহিনী রটিয়ে কিছু লোক এক ধরনের বিকৃত আনন্দ পায়। তার চেয়েও অবাক হলাম যখন দেখলাম কয়েকজন তথাকথিত উচ্চশিক্ষিত লোক মুসলমানদের উপর নানা অত্যাচারের সত্যি বা কল্পিত কাহিনি বলে বা শুনে বিশেষ আনন্দ পাচ্ছেন। এঁদের মধ্যে দু-তিনজন রীতিমত বিখ্যাত লোক। প্রয়াত এক পন্ডিত ব্যক্তি, যাঁর নাম শুনলে অনেক নিষ্ঠাবান হিন্দু এখনও যুক্তকরে প্রণাম জানায়, তাঁকে এবং সমবেত অধ্যাপকদের কাছে নিকাশিপাড়ার মুসলমান বস্তি পোড়ানোর কাহিনি বলা হচ্ছিল। যিনি বলছিলেন তিনি প্রত্যক্ষদর্শী এবং বিশ্বাসযোগ্য লোক। বেড়া আগুন দিয়ে বস্তিবাসীদের পুড়িয়ে মারা হয়। একজনও নাকি পালাতে পারিনি। ছেলেটি বলছিল, কয়েকটি শিশুকে আগুনের বেড়া টপকে তাদের মায়েরা আক্রমণকারীদের হাতে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল, যাতে ওদের প্রাণগুলি বাঁচে। বাচ্চাগুলিকে নির্দ্বিধায় আবার আগুনে ছুঁড়ে দেওয়া হয়। আমরা শুনেছিলাম, এই কুকীর্তির নায়ক কিছু বিহারী কালোয়ার। তাই ভয়াবহ বর্ণনাটি শুনে সুশোভনবাবু মন্তব্য করেন, “এর মধ্যে নিশ্চয়ই বাঙালি ছেলেরা ছিল না?” শুনে সেই পন্ডিতপ্রবর গর্জে উঠলেন, “কেন, বাঙালি ছেলেদের গায়ে কি পুরুষের রক্ত নেই?”

যে জন্তুগুলো সেদিন মুসলিম নারী-শিশু-পুরুষদের পুড়িয়ে মারার মধ্যে সেদিন প্রচন্ড উৎসবের আনন্দ পাচ্ছিল, তাদের পাশাপাশি লেখক-বুদ্ধিজীবী-পন্ডিত নামধারি আরেক পশুরা সে পিশাচী উৎসবের খবর শুনেই প্রচন্ড পুলকিত হচ্ছিল। কেউ

6 / 8

বাংলাদেশে বুদ্ধিবৃত্তিক দুর্বৃত্তি

Written by ফিরোজ মাহবুব কামাল
Thursday, 05 August 2010 19:03 - Last Updated Sunday, 21 January 2018 15:14

সেদিন সে ঘটনার প্রতিরোধে ময়দানে নামেনি, নিন্দাও করেনি। কলকাতার পুলিশ ও দমকল বাহিনীর বেশীর ভাগই ছিল হিন্দু, তারা সেদিন রাস্তায় নামেনি। কলকাতার প্রায় ৭৫% ভাগ বসতি ছিল হিন্দু। মুসলমানদের সংখ্যা বড় জোর ২৫%। অথচ সে কলকাতায় বসে সমগ্র বাংলার ক্ষমতায় ছিল মুসলিম লীগ সরকার। এটি হিন্দুদের পছন্দ হয়নি। তাই সাধারণ মুসলমানদের থেকে তারা বদলা নিয়েছে। চোর-ডাকাত ও অপরাধীগণ তাদের স্বার্থ-উদ্ধারে মিথ্যা বলবে সেটাই স্বাভাবিক। তারা খুণখারাবী ও ধর্ষন ঘটায়। এগুলো নেহাতই তাদের পেশা। কিন্তু মিথ্যাচারে লেখক, সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবীগণও যে কতটা জঘণ্য হতে পারে তার নমুনা রেখেছে কলকাতার বাঙালী বুদ্ধিজীবী, লেখক ও সাংবাদিকগণ। কলকাতার সে হত্যাযজ্ঞের পর শুরু হয় প্রচন্ড মিথ্যাচার। দোষ চাপানো হয় প্রধানমন্ত্রি সোহরোয়ার্দীর নেতৃত্বাধীন মুসলিম লীগ সরকারের উপর। ১৯৪৬ সালের ১৬ আগষ্ট ছিল কলকাতার গড়ের মাঠে ছিল মুসলিম লীগের জনসভা। তাদের কথা সত্য হলে বুঝতে হবে মুসলিম লীগ নেতাদের নিশ্চয়ই মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটেছিল। কলকাতার মাত্র ২৫% ভাগ মানুষ মুসলমান। তারা কি ৭৫% মানুষকে দাঙ্গা বাঁধিয়ে নির্মূল করে কলকাতাকে পুরাপুরি মুসলিম-শহর বানাতে চেয়েছিল? হিন্দু লেখক, সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবীগণ অভিযোগ এনেছিলেন, মুসলিম লীগ পরিকল্পনা করে হামলা করেছিল। তাদের প্রস্তুতিই যদি থাকতো তবে কি হিন্দু পাড়ার মধ্যে তারা নিজ মেয়েদের কি হোস্টেলে রাখতো? বরং প্রস্তুতি ছিল হিন্দুদের। তারাই জনসভা থেকে ফেরা নিরস্তু মুসলমানদের উপর হাওড়া ব্রিজের উপর অস্ত্র নিয়ে হামলা করে। হামলা করেছিল শহরের আরো অনেক হিন্দুপ্রধান প্রতিটির মহল্লার রাজপথে। পরিকল্পিত ভাবে হামলা হয়েছিল মুসলিম বস্তিতেও।

বুদ্ধিবৃত্তিক ব্যর্থতা তাই উভয় বাংলার। একই দুষিত কূপের পানি পানে উভয় পাড়ার বাসিন্দারাই সমভাবে পেটের পীড়ায় আক্রান্ত হয়, তেমনি একই চেতনায় বেড়ে উঠলে কুপ্রবৃত্তিগুলোও বাড়ে একই ভাবে। তাই কলকাতার বুদ্ধিজীবীগণ যে অপরাধ করেছিল ১৯৪৬ সালে, অবিকল সেটিই সংঘটিত হয়েছে ঢকার বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা। উভয়ের সাহিত্য, সংস্কৃতি ও বুদ্ধিবৃত্তিক অপুষ্টির উৎস্য এক হওয়াতে বুদ্ধিবৃত্তির মানটিও এক। অথচ ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্টিত হয়েছিল মুসলমানদের চেতনার পুষ্টির একটি ভিন্নতর উৎস্যকে সুনিশ্চিত করতে। এবং সেটি ইসলামের। ১৯৪৭ সালের পর শুরুতে আকরাম খাঁ, ফররুখ আহমদ, বেনজির আহমেদ, গোলাম মোস্তাফা, শাহেদ আলি, তালিম হোসেন, সাজ্জাদ হোসেন প্রমুখ কবি-সাহিত্যিকদের দ্বারা সে ধারার কাজ ঢাকাতে কিছুটা শুরুও হয়েছিল। তাই নিরোদচন্দ্র চৌধুরির দৃষ্টিতে সে সময় কলকাতার বুদ্ধিজীবীগণ আত্মঘাতি মনে হলেও ঢাকার বুদ্ধিজীবীদের মাঝে তিনি আশার লক্ষণ দেখেছিলেন। সিন্দাবাদের ন্যায় তখন তাদের মধ্যে জাগ্রত হয়েছিল “পাল তুলে দাও ঝান্ডা উড়াও” এর ইসলামের বিপ্লবী চেতনা। বুদ্ধিবৃত্তিকে তারা শিল্প রূপে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন উন্নত মানুষ গড়ার। ফলে তখন ভিন্ন ভাষার বিহারীদেরও সে সময়ের বাঙালীরা আপন করতে শিখছিল। দস্যুতা ও দুর্বৃত্তিকে মানুষ তখন দুর্বৃত্তি জেনে ঘৃনা করতো। কিন্তু কলকাতার সে বুদ্ধিবৃত্তিক মহামারি ঢাকায় আসতে বেশী সময় নেয়নি। ফলে নীরোদচন্দ্র চৌধুরির সে আশাও নিরাশায় পরিণত হয়। ঢাকার বুদ্ধিবৃত্তিক মহল প্লাবিত হয়েছে মূলতঃ সে অভিন্ন অপ-বুদ্ধিবৃত্তির বিষাক্ত স্রোতে। ফলে ১৯৪৬ সালের কলকাতার হত্যাযজ্ঞই একাত্তরে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় আরো বীভৎসতা নিয়ে। বাংলাদেশের বুদ্ধিবৃত্তির পতন-যাত্রা এখনও দ্রুত ধেয়ে চলেছে সে অভিন্ন পথেই। সে পতন যাত্রার নায়ক বাংলাদেশের সেকুলার বুদ্ধিজীবীরা। তারা ফেরি করছে কলকাতার সেকুলার মতাদর্শের। তারাই এখন দেশে সবচেয়ে পথভ্রষ্ট। ন্যায়নীতি ও বিবেক বোধ এখনও যেটুকু বেঁচে আচে সেটি গ্রামের কৃষক,শ্রমিক বা তাঁতী পাড়ায়; বিশ্ববিদ্যালয়, পুলিশ দফতর, কোট-কাচারি বা অফিস পাড়ায় নয়। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়, প্রশাসন, বিচারালয়সহ যেখানেই এসব তথাকথিত শিক্ষিত ব্যক্তি বা বুদ্ধিজীবীদের ভিড় সেখানেই দুর্বৃত্তি এখন প্রকট। এরাই তো বাংলাদেশকে দুর্বৃত্তিতে ৫ বার শিরোপা পাইয়ে দিয়েছে।

পাকিস্তান আমলে অনৈসলামের যে স্রোত সীমান্ত দিয়ে চুইয়ে চুইয়ে প্রবেশ করতো এখন সে স্রোত ঢুকছে বাঁধভাঙ্গা জোয়ারের ন্যায়। দেশের সাংস্কৃতিক ও আদর্শিক সীমানা বিলুপ্ত করা হয়েছে ইচ্ছা করেই। এবং সেটি অভিন্ন কলকাতাকেন্দ্রীক বাঙালী সংস্কৃতির জোয়ারে ভাসার তাগিদে। দুর্বৃত্তিতে বার বার শিরোপা পাওয়ার মধ্য দিয়ে প্রমানিত হয়েছে, সাংস্কৃতিক প্লাবনের সে দুষিত পানি বাংলাদেশের মানুষের কি ভয়ানক ক্ষতিটাই না করেছে। পনেরো কোটি মানুষের একটি দেশকে বিনাশ করার জন্য এরপরও কি শত্রুপক্ষের কোন যুদ্ধের প্রয়োজন আছে? বাংলাদেশের সেকুলার বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিবিদ এবং সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাদের এটিই হলো সবচেয়ে বড় অপরাধ। বাংলাদেশের জন্ম অবধি এসব সেকুলারগণই বাংলাদেশের শাসনকর্তা। তাদের কারণেই দুর্বৃত্তি বা দুর্নীতি এখন আর রোগ নয়,জাতীয় নীতিতে পরিণত হয়েছে। বুদ্ধিজীবীদের সাহিত্য, শিল্প, লিখনি ও বক্তৃতা হয়ে দাঁড়িয়েছে এসব দুর্বৃত্তদের পক্ষে সাফাই গাওয়ার হাতিয়ারে। ফলে বাংলার ইতিহাসে কুকর্মের সবচেয়ে কুৎসিত নায়কগণও সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী রূপে ঘোষিত হচ্ছে। বুদ্ধিবৃত্তিক দুর্বৃত্তির এর চেয়ে বড় নজির আর কি হতে পারে?

7 / 8

বাংলাদেশে বুদ্ধিবৃত্তিক দুর্বৃত্তি

Written by ফিরোজ মাহবুব কামাল
Thursday, 05 August 2010 19:03 - Last Updated Sunday, 21 January 2018 15:14

গ্রন্থপঞ্জি

১). তপন রায়চৌধুরী, ২০০৭; বাঙালনামা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯।

২). সিরাজুল্ ইসলাম চৌধুরি, ২০০৮; দুই যাত্রায় এক যাত্রী, জাগৃতি প্রকাশনী,৩৩ আজিজ সুপার মার্কেট, নিচতলা, শাহবাগ, ঢাকা-১০০০।

৩). নীরদচন্দ্র চৌধুরী,১৯৮৮; আত্মঘাতী বাঙালী, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০, শ্যামারণ দে ষ্ট্রিট,
কলকাতা-৭৩।

৪). ডক্টর সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন, ১৯৯৩; একাত্তরের স্মৃতি, নতুন সফর প্রকাশনী, ৪৪, পুরানা পল্টন (দোতালা),
ঢাকা।

8 / 8